আমলাদহির জার্নাল

(সার্ভে ক্যাম্প –১৯৬৩। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'ছায়াপথ' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ঈষৎ মার্জিত হয়েছে।)

বিশ্বাস ক(ন, আমাদের মনে বয়স্ক অভিজ্ঞতার পুরু জমাট প্রলেপ নেই এবং সেকারণে স্বভাবতই এই মনকে আতিপাতি খুঁজে পুরোনো পিঞ্জর খুলে কোন হীরক-ঘটনার দিকে স্বপ্নার্ত দৃষ্টির ডানা ছড়িয়ে উন্মনা হতে হয় না। তবু স্মৃতিচয়নে দুর্বলতা বা আনন্দ-বিহ্বল বেদনার আসন থেকে যায়।

স্মৃতিচয়নে বেদনা কেন? হয়তো স্মৃতি অতীত ঘটনার কংকাল বলে সেখানে নতুন করে অস্থিমজ্জার প্রলেপে স্নায়ু প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে না – সময়ের স্রোতে শুধু একটানা পাতাঝরার শব্দ শোনা যায়। আমার মনে হয় স্মৃতিরা যেন বেহুলার মতো – গাংগুড়ের জলে ভেসে চাল যায় শুধু। ওরা কি সত্যি বেহুলার মতো?

যথেষ্ট শ্রমের মধ্যেও আমরা আমাদের ক্যাম্পের তাবু ভালোবেসেছি। কেউই না বেসে স্বাভাবিক হতে পারেনি। যেন সেটাই নিয়ম। অন্তত শেষ দিনটিতে সকলেই তাদের ফেলে-যাওয়া দিনের কথাগুলো ভাবতে চেষ্টা করেছে। তাদের নৈমিত্তিক কোলাহল, ন্যায়-অন্যায়ে-সীমায়িত উচ্ছ্বাস-আনন্দ, ছোটখাট কলহ-বচসার চিন্তায় একটু বিরহী হয়েছে। ভেবে হয়তো একথাও স্বীকার করেছে, দুনিয়ার ব্যস্ততার পাখা-ঝাপটানোর মধ্যে থেকেও আমলাদহির ফাঁকা মাঠের জনবিরল তেরোটি দিন ভালো বেশ ভালো ছিল। যে সব মুহূর্ত এতদিন কথায়-সুরে শব্দের উচ্ছলতায় প্রাণৈশ্বর্যে বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলাম, এরপর তারা নির্জনতায় ডুবে গেল। শুধু সকাল-সন্ধ্যায় ঘর-ফেরা সাঁওতাল মজুরেরা পথ চলবে, কথা বলবে আর দুএকটা লরির চাকা পথে ঘুরবে এখানে – আমাদের ফেলে-আসা তেপান্তরের মাঠে ।

সার্ভে ক্যাম্পে আমরা কয়েকটা দিন কেবলমাত্র পরিকল্পিত সূচীর কাছে আত্মসমর্পিত ছিলাম। জমির জরিপ হাতেনাতে শেখা – নিয়মিত সেই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কঠোর মনোভাব তো ছিলই। সেই সঙ্গে ছিল জীবনের রূঢ় কিছু প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু অবসর। স্বীকার করি এরও মধ্যে রোমান্সের ফল্গুধারা থাকা সম্ভব। আসল কথা হল, আমরা বাংলা-বিহারের এমন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি যেখানে

আকাশ-মাটি হৃদয়বৃত্তিকে কষাঘাত করে উন্মুক্ত প্রান্তরে দৌড় করাবেই। উন্মাদ করে দেবে। তাই যদি হয়, তবে আমরা বিবেকের কাছে অনেক বেশি মেঘমুক্ত থাকব। তাই না? আমার এ প্রশ্ন বন্ধু মুজাফফরকে।

ভালো লাগার মন ও অবসর দুটোই আমরা বিশেষভাবে রচনা করতে পেরেছিলাম। মাথার উপরে বিশাল আকাশ। আর যেদিন রুদ্র আনন্দে পৃথিবী নেচে উঠেছিল, সেই নৃত্যরতা ধরণীর নিস্পন্দ ছবি উন্মোচন করে রেখেছে চারদিকের লালমাটি পাথর। নতুন দেশের অচেনা পথ, মাটির গন্ধ, পথচলতি মানুষের নির্জন কণ্ঠস্বর – এসব দুচোখ ভরে দেখে দেখেও ক্লান্ত হইনি।

কেমন আশ্চর্য লাগে – এখানে কোন মানুষ বা মানুষীর পথচলার ছন্দটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনা যায়। এভাবে প্রতিদিন খুশির উপল স্রোতে আত্মবিস্মৃত ছিলাম। যদি প্রশ্ন করি, এসবের মধ্যে অমৃত ছিল কোনটা, তবে শুধু মুজাফফর বা অশোক রায় কেন, সকলেই প্রায় উত্তর দেবে – সেই সরু তরংগময় উজ্জ্বল প্রবাহ যার নাম অজয় নদী। প্রথমদিন থেকে বিদায়বেলার শেষদিন পর্যন্ত যার বিস্ময় আর আনন্দ কখনো ফুরিয়ে গেল না।

অজয়ের শীতল জলধারায় সত্যি গভীরতা ছিল না। অথচ শ্রান্ত শরীরকে পাতাল-পাথরের বুকের কাছে শায়িত রেখে শতধা স্রোতের মৃদুগতি উপভোগ করতে প্রতিদিন ছুটে গিয়েছি। অনেকটা সময় ধরে স্নান করতে। ফিরে দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে বিকেল হয়েছে। তবু অজয়ের নির্মল জলে শরীর-মনে পুণ্য সঞ্চয় করতে চাইতাম রোজ। অশোকের নেচে-ওঠা মনের কথা বেশ মনে আছে। ও বারবার চেঁচিয়ে বলে উঠত – আমি বীরভূমে ঠিক এমনি নদীতে স্নান করতে আসতাম। গাছপালা-পাথর অবিকল এমনি সাজানো ছিল তীরে।

হয়তো জ্যোৎস্না-ধোওয়া অজয়ের হিম বালুচরে পরি নেমে আসতো। আমি একবারও তা দেখে উঠতে পারিনি। ওরা কি দেখেছে? ক্যাম্প-ফায়ারের দিন রাত বারোটার পরে কেউ কেউ দু'পা বাড়িয়ে দিয়েছে ওদিকে। তবু আমার যাওয়া হয়নি। ভালো লাগেনি। অবসাদ ছিল মনে। অবসাদের বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছে। মানুষ যা করে তার কিছু কি হৃদয়ের ভিত্তিতে যাচাই করা উচিত নয়? অন্তত মানুষ হিসেবে খানিকটা?

বলে রাখি – ক্যাম্প থেকে একবেলা করে পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়ে প্রায় শেষের দিকে টিচার্সদের কাছে বেদম ঝাড় খেয়ে এসব খেদের কথা বলা।

আমলাদহির বাজার ছাড়িয়ে কানগই পাহাড়। পাশ দিয়ে চিত্তরঞ্জন থেকে বাস যায় আসানসোল। প্রথমদিন ভোরের শীত-কুয়াশায় আর হালকা রোদে স্টেশনে বসে ওই পাহাড় দেখে প্রমিস করেছিলাম ওই কানগই পাহাড় শীর্ষে আমাদের পা রাখতেই হবে।

একদিন পাহাড়ের সামনে এসে থমকে গেলাম। বিরাট এক একটি খণ্ড পাথর। বিরাটত্বের প্রেরণায় মানুষের সুপ্ত বল বোধ হয় আসুরিক হয়। সেজন্যেই আমরা তখন ছুটতে পারি — উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতে পারি। তুলনামূলক সহজ পথ ছেড়ে কষ্টকর বাঁকা পথে পাথরের খাঁজে শরীরের ভর ছুঁড়ে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে আমাদের উচ্চতা হল শীর্ষের মন্দিরের কাছাকাছি। সেখান থেকে সমস্ত চিত্তরঞ্জনের প-্যান একচোখ পড়া যায়। প-্যান নয়, এই মনে এখন দৃশ্য দেখার ফিকির — কিছু সবুজ রঙ, রঙিন ঘরবাড়ির মাঝে কালো সরু পিচের রাস্তার আবেষ্টনী, আরো দূরে দৃষ্টি-ছোঁয়া দিগন্ত অবধি বিস্তীর্ণ লালচে মাঠ। কালো পাথরে দর্শকজনের সইসাবুদ। আমাদের মতোই তারা এই ছোট্ট পাহাড়-জয়ের ঘটনাটি অমর তাজমহল করে তুলতে চায়। আমরাও তো চেয়েছিলাম।

অশোক বারবার খেই হারাল। সন্ধ্যার আলোটুকু পাতলা হয়ে যাচ্ছে। এই মৃদু আলো আর নির্জন বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের পৃথিবীর কাছে যেতে যেতে সকলেই যেন বেদনাহত মুখটি গোপন করে ভাবতে চেয়েছে যে কয়েক মুহূর্তের জন্য এসে এখুনি চলে যাওয়ার মনটি আসলে হারিয়ে গিয়েছে। তবু নিচে নেমে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নির্জন পাথর ছড়ানো প্রবীণ পাহাড়ের উঁচু দুনিয়ায় বসে গান গাওয়ার দুর্লভ সুযোগের থেকেও মূল্যবান নিয়মিত সময়ে ক্যাম্পের রোলকলে উপস্থিত থাকা।

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখেছি একখানা খেলনা-রেলগাড়ি ধুয়ো ছেড়ে দিগন্তলীন হল। আরো দূরে জলের রঙ চেনা যাচ্ছে। ওটা কি নদী? কেউ যেন বলল — মাইথনের জলাধার। অবাক হলাম — মাইথন বাঁধ এত কাছে?

বুঝেছি তখনি যে এই শোনাই আমাদের কাল হবে। মুজাফফর বলল — তাহলে একচোখ তো একদিন দিতেই হবে, কি বলো?

সোৎসাহে জবাব দিলাম — নিশ্চয়ই।

মাইথন যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে একদিন কাছেই রূপনারায়ণপুর ঘুরে এসেছি। ওখানে বরাকর নদী আছে আর তার ওপারে অবিশ্রান্ত পাহাড়ের সদম্ভ ঘোষণা আছে। হয়তো তার মধ্যে কারো নাম কালিপাহাড়। কালোবাজারের দাপটে যতটুকু সময়

সংগ্রহ করেছিলাম, খরচ করে নদীর পারে পৌঁছেই তখুনি ফেরার কথা ভাবতে হয়েছে। আর তখন মেঠো পথ ধরে সাঁওতাল মেয়েরা গুচ্ছে গুচ্ছে সারি বেঁধে ঘরে ফিরছিল। আর অজস্র পাখির কলকাকলিতে সন্ধ্যা ঘনাল। আকাশে বাধ্য হয়ে রঙের জমজমাট জেল্লা আর তেমন রইল না। কয়েকটা পাখি ক্লান্ত ডানায় নেমে এল ঘুরে ঘুরে। পৃথিবীতে এমন দুয়েকটি দৃশ্য নিশ্চয়ই অপ্রতুল। আসলে আমি নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলাম আর ভাবছিলাম এমন দৃশ্য কখনো সুলভ হতে পারে না।

বরাকর নদীর বিশাল প্রবাহের সকল সম্ভাব্য তাণ্ডবকে রুদ্ধ করে রেখেছে মাইথন বাঁধ। মানুষের উদ্যমের কথা এই বাঁধে এলে সকলেরই মনে হবে। একপাশের জলে বোটের ব্যবস্থা আছে। ওপাশে পাহাড়ের কোলে ক্লাবঘর। দুটো পেডাল বোটে ঘড়ি মিলিয়ে ছিলাম মোটে পনেরো মিনিট। ছোট সেতুর শেষে ছোট দ্বীপের উপর বাগানওয়ালা বাড়িটা কিসের? মালি জল দিচ্ছিল ফুলবাগানে। জানলাম — এটা রেস্টহাউস। প্রচুর আলো-বাতাসে ভরপুর এই দ্বীপে কিংবা রাতের মিষ্টি নির্জনতায় এখানে বসে এক একটি মুহূর্ত-ব্যয় করছি, এমন ভাবতে ভালো লাগছে। প্রচণ্ড আপশোষ ছিল এত পাহাড়ের মধ্যে একটি পাহাড়েও চড়া হল না বলে। ভীষণ রাগ হতে লাগল — ওহ্, চারদিকে সময়ের বড়ো টানাটানি যাচ্ছে। অথচ এরই মধ্যে সাফল্যের বাগিচা নির্মাণ করতে হবে। এই এক আশ্চর্য বিরোধ।

অশোক রায় বলল — এখানে আমি আবার আসব।

বাঁধের উপর বারকয়েক পাক দিলাম। ওপাশে টাংগা দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম — বরাকরের ভাড়া কত?

ভাড়া শুনে চোখ চড়কগাছ। আজ থাক। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে এক ছুট দর্শন সেরে ফিরতি বাসের সৌভাগ্যলাভ হবে কিনা ভাবছিলাম। কয়েকদিন পরে এসে অন্যান্য বন্ধুরা এখানকার সর্বফলদাতা গাছের ডালে পাথর বেঁধে গিয়েছিল(ওদের প্রার্থনা ছিল — রোলকলে যেন লেট না হয়।

আমরা সেসব কিছু করিনি। শুধু অশোক বাসের ড্রাইভারকে বলল — চিত্তরঞ্জন শপমে কয় বাজে পৌঁছেগা?

— ও তো বাবু সওয়া সাতমে ।

— আরে নারে ভাই। সাতমে পৌঁছেগা। উধার ক্যাম্পমে সাত বাজকে নাম প্রেজেন্ট করনা পড়েগা। থোরা জলদি কিজিয়ে।

— ঠিক হ্যায় বাবুজি। দেখতে হ্যায়।

দূর থেকে চিত্তরঞ্জন লোকো ওয়ার্কসের ঘড়িতে তখনো সাতটা বাজেনি। বাসে দেখা হল শতদল, সুজিত আর প্রশান্তর সঙ্গে। আসানসোল থেকে ফিরছে ওরা।

একটু সময় আছে হাতে — ছোটো। প্রাণপণে ছুটলাম সকলে। সেদিন রূপনারায়ণ থেকে ফেরার সময় কেবল কোম্পানির জিপ আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল ক্যাম্পে। আজ কোন জিপ নেই। একটু শ্বাস নিয়ে আবার ছুটছি। শ্রান্ত পা। তবু শরীরকে সোজা রেখে ছুটছি। হাঁপিয়ে পড়েছি তবু ছুটছি। তারপর রোলকলে যখন পৌঁছলাম তখন সবে আমার রোল নাম্বার ডাকা হয়েছে — এহট্টি সিক্স?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম — প্রেজেন্ট স্যর।

আলো-বাতাস আর আনন্দ-উদ্বেগে ভরা সেসব দিন ভাবতে বসলে আজ ভালো লাগে।

একদিন মুজাফফর আবিষ্কার করল — আমরা আগের দিনের থেকে পরের দিন ঘুরতে বেরিয়ে পথ চলি আরেকটু বেশি। কথাটা সত্যি তাই।

মাঠে সেদিন সার্ভের কাজ ছিল। বেলা নটা থকে বারোটা পর্যন্ত থিয়োডোলাইট আর মাথা বাঁচানোই প্রধান কাজ। তবু সুন্দর সকাল ছিল সূর্যের আলো আর মেঘের লুকোচুরির ফাঁকে ফাঁকে।

বেলা বারোটা অবধি আমরা দুজন, আমি আর মুজাফফর, সার্ভে করব। তারপর দলের অন্য তিনজন কাজে হাত দেবে। এরকম অলিখিত চুকতি ছিল পাঁচ জনের দলের মধ্যে। আমাদের ভাগের কাজকর্ম সেরে হাঁটতে হাঁটতে অজয় পেরিয়ে বিহারে এসে পড়লাম মুজাফফর আর সুশান্তর সাথে।

দুএকটা নির্জনতা-মাখা বাড়িঘর, ফসল-কাটা মাঠ, কাঁচাপথের বেণি আর সমস্ত দিগন্ত জুড়ে লালমাটির বুকের বিস্তার, সবুজ গাছের শান্ত মন। সুশান্ত গাইল — গ্রাম ছাড়া এই রাঙামাটির পথ। শান্তি ছড়ানো আকাশে আর আকাশের নিচে আমাদের মন তরংগময়। উঁচুজমি নিচুজমির ঢাল-চড়াই পেরিয়ে পাতায় ছাওয়া কুটিরের কিনার দিয়ে চলতে চলতে — আহ্, চলাটাই যে কি বিরাট নেশা! এমনি দুপাশে শাল মহুয়ার নিবিড় আলিঙ্গনে হারানো সময় যেন পরম লগ্ন বলে মনে হল। আবার গান হল — আমার যেমন বেণি তেমনি রবে। আমিও গলা মেলালাম। এই পরিবেশে যে গান গায় সেই তো শ্রোতা। তখন গান স্বতোৎসারিত, আবেগ উচ্ছ্বসিত। সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি — মুজাফফরের গলায় শব্দ হয়, সুর হয় না, তবু ও গান গায়। এই তো চরিত্র।

অজয়ের অনেকগুলো বাঁক ফেলে আবার আমরা নদীতীরে এসে পড়লাম। নদী পেরিয়ে তাবুতে ফিরব। এক বাগান থেকে কুল পেড়েছি পকেট ভুর্তি করে। নাতির কাঁধে হাত রেখে বৃদ্ধ লোকটি বলেছিল — আবার আসবেন।

মানুষ কেন ছবি তোলে? পরিণত চোখে পুরোনো পাতার জীয়নকাঠিতে ফেলে-আসা দিনের রামধনু দেখে আশ্চর্য আনন্দ-বেদনায় আপ্-ুত হলে বলে? পরিণত বয়সে আমাদেরও এসব কথা মনে পড়বে? তাই না?

মাইথনের পরে আরেক দুপুরে বরাকর গেলাম রামনগর কোলিয়ারীর পাশ দিয়ে। স্নান সেরে মুখে কিছু ফেলে ছুটেছিলাম বাসের জন্য। পানচেত আসার উদ্দেশ্য ছিল না তখনো। এলোমেলো স্টেশন রাস্তায় ঘুরছিলাম। জানতাম না যে ওখান থেকে পানচেত যাওয়ার উপায় আছে। জানলাম এক রিকসা চালকের কাছে। এলোমেলো ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল — যাবেন কোথায়?

বেলা তখন তিনটে। বললাম — যাব আর কোথায়? এখানে দেখার কিছু আছে নাকি!

— এখানে কি আর দেখবেন। পানচেত চলুন। বাস-ট্যাকসি ধরিয়ে দেব।

মুজাফফর বেপরোয়া হয়ে রিকসায় চেপে বসল। অগত্যা। ট্যাকসিতে যেতে যেতে দূরের ধূসর পাহাড় ইংগীত করে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম — ওটা কি দাদা?

— পাঁচকূট পাহাড়।

মুজাফফর সামাল দিল — ও অনেক দূর হবে। আমাদের যাওয়া হবে না।

পানচেত বাঁধের নিচে প্রচুর পাথর ছড়ানো। লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে সশব্দে। হু হু করে। তারপর ওপাশের জলস্রোতে মিশে যাচ্ছে। ডাউনস্ট্রিমে বাঁধের নিচের দিকে নেমে এলাম। পায়ের কাছে দামোদরের নীল জল। বাতাসে ভরা উল্লাসের শব্দ। পাথরে পাথরে ছুটে বেরালাম খুব। কাঁটাতার ডিঙিয়ে বাঁধের উপর এসে দাঁড়ালাম। মাইথনের তুলনায় পানচেত কিন্তু বিবর্ণ মনে হল।

ছোট নিশ্বাস ফেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম — চলো হে, ফেরার সময় হয়েছে ঘরে।

বাসের জন্য দাঁড়াতে হয়নি। ধানবাদ-আসানসোল বাস আমাদের চারকুণ্ডা নামিয়ে দিল। ব্রিজ পেরিয়ে বেগুনিয়া ঘুরে বরাকর এলাম। কিন্তু এ কি কোন বাস নেই কেন। স্টেশনের কাছে মাড়োয়ারি বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাড়ছে।

ট্রাফিক পুলিশ জানাল — বগলা ট্রান্সপোর্টের গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই বাস চলছে না। ভালো হয় যদি রূপনারায়ণপুর পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়।

তো সেই বাসটা পাওয়া গেল। রূপনারায়ণপুরে ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম। দুবার করে খবরের কাগজ পড়েও সময় কাটে না। বাসের দেখা নেই। একটু পরে যে বাসটা এল সেটা আমলাদহির বাজার ছাড়িয়ে নামিয়ে দিল খানিকটা দূরে। আজ আর ছুটবার প্রয়োজন নেই। যা হবার তা তো হবে। ক্যাম্পে রোলকলে উপস্থিত না থাকার জন্য আপ্যায়ণের কথাটা ভেবে একটু বিশ্রী লাগছে। এত(ণকার সমস্ত আনন্দ যেন শুকিয়ে মাটি হয়ে গেল।

এরপর ক্যাম্পে আমাদের কালপ্রিট হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। তাতে মনে মনে খুব যে দুঃখ পেয়েছিলাম, তাও নয়। কেননা চিত্তরঞ্জনের পরিপার্শ্ব থেকে যা পেলাম তার তুলনায় ওই বদনাম নিতান্ত বাহ্য। তবু খতটা খতই — নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ তো নয়।

চিত্তরঞ্জনে আর জয় করার মতো কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কানগই পাহাড়, সুন্দরী পাহাড়, আমলাদহি-ফতেপুর-মিহিজামের মাঠ-বাজার-পথ, অজয় নদী, এমনকি এখানকার ওয়াটার সাপ-ই পয়েন্ট, মায় ফ্লাওয়ার শো পর্যন্ত দেখা হয়েছে। যদি যেতে হয়, তবে তাকাও পশ্চিমে — ধানবাদ-মধুপুর-গিরিডি, যশিডি বা দুমকার দিকে।

প্রায় কোন দুশ্চিন্তার অবকাশ না রেখে একদিন তিনখানা প-াটফর্ম টিকিট কেটে ঝুলে পড়লাম যাত্রী-বোঝাই তুফান এক্সপ্রেসে। নামতে চাইছি মধুপুর।

কাউন্টারের একজন বলেছিল মধুপুর থেকে বাস বদলে চিত্তরঞ্জন ফিরে আসতে পারব আমরা। রোজকার রোলকলে সময়মত হাজিরা দিতে অসুবিধা হবে না। তিনজনেই তখন ভয়ানক একমত — ক্যাম্পের ঐ দাবিটুকু মিটিয়ে চলা এখন ভীষণ ভীষণ দরকারী। উপরওয়ালার পরোয়ানা যে অন্যরকম ছিল, সে তো আর জানা ছিল না।

প্রীতম সিং রেলের ইঞ্জিনিয়ার। কথায় কথায় জানালেন — মধুপুর থেকে ফেরার একমাত্র উপায় রাতের মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ধরে ধরা — চিত্তরঞ্জন পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা তো হবেই।

মাথায় বজ্রাঘাত। তাহলে উপায়? প্রীতম সিং বলেছিলেন — মালগাড়ির গার্ডকে বলেকয়ে অন্য উপায় দেখতে। এ লাইনে মালগাড়ি চলে খুব। চেষ্টা করে দেখা হল। হতাশ হলাম। আশাভরসা ত্যাগ করে শেষবারের মতো ক্যাম্পের দুর্যোগের কথা

ভেবে শিহরিত হচ্ছি। ভেবে কোন লাভ নেই জানি, তবু চিন্তারা অমর। প্রীতম সিং ইতিমধ্যে আমাদের টিকিট না-কাটার হেনস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মধুপুর স্টেশন চত্বর পার করে দিয়ে।

মধুপুরের বিবরণ উৎসাহজনক হবে না। ওখান থেকে দূরের ধূসর পাহাড়ের রেখাচিত্র দুমকা হবে। টাংগার ভাড়া অবিশ্বাস্য — আমাদের নাগালের বাইরে। কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে হল। ঐ দূরের ইংগীত সত্যি বড়ো লোভনীয় ছিল। মধুপুরের পথে পথে ঘুরে রাতে তাবুতে ফিরেছি। এরপর আর ক্যাম্প থেকে আমলাদহির বাইরে আর পা রাখিনি।

যাব কি? এদিকে মোটামুটি যা ঘোরার তা তো ঘোরা হয়েছে। ওদিকে ক্যাম্পে প্রফেসর শ্রী ভোলা ঘোষের কাছে মুচলেকা দিয়ে রেহাই পেয়েছি। লাভের মধ্যে লাভ — সমস্ত দুষ্কর্মের প্রধান দায় লম্বা সিরিংগে চেহারার মুজাফফর আহমেদ খানের, ছোটখাট ভোলেভালা মিচকে চেহারার আমার তো নয়।

শেষদিনে কোলাহলমুখর মাঠ নির্জনতায় ডুবিয়ে দিয়ে আমরা আবার মোগলসরাই প্যাসেন্জারে সওয়ার হয়ে ঘরে ফিরেছি। ফেলে-আসা দিনের কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছি। পীড়া বোধ করেছি এই ভেবে যে যেখানে এই তেরোটা দিন আমরা হৈ চৈ করে কাটিয়েছি, যেখানকার মাটিপাথর উথালপাথাল জমি চষে বেড়িয়েছি, মাপজোখ করেছি, সেই জায়গাটা পরে তো চিনে নিতে অনেক কষ্ট হবে। অনেক দেরি হবে খুঁজে নিতে। আর সেটা যেন নিজের কাছে অপমানজনক ও বেদনাদায়ক হয়ে বাজল।